সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দুমেলা

Issue cover not available

Vol. 12 | No. 1 | 1968

Check for updates

Volume	12
Issue	1
Year	1968
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anwar Pasha
Published online	June 15, 1968
DOI	10.62328/sp.v12i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v12i1.6
Pages	189-220
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দুমেলা

আনোয়ার পাশা

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলা দেশে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হচ্ছে দেখতে পাই। একটি হিন্দুদের, নাম হিন্দুমেলা। অন্যটি মুসলমানদের, নাম মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি। দুটি নামের মধ্যেই একটি কথা স্পষ্ট যে, প্রতিষ্ঠান দুটি একান্তভাবে ছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যেহেতু উভয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার চেহারাটাই তখন ছিল আলাদা, অতএব উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম তখন সম্ভব ছিলনা। সম্ভব না হওয়ার এই ব্যাপারটা দুই সম্প্রদায়ের জীবনে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং স্বতন্ত্র ফলদায়ক হয়েছিল।

'হিন্দুমেলা'—নামটির মধ্যে যেমন একটিও ইংরেজি শব্দ নেই, তেমনি 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামের মধ্যে নেই একটিও বাংলা শব্দ। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি যে ভালোবাসা এখানে প্রকাশ পেয়েছে সেই ভালোবাসার অভাব রয়েছে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে, নামকরণের মধ্যেই একটা মানসিকতা প্রকাশ পায় এ কথা সত্য ব'লে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে বলতেই হবে, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির উদ্যোক্তাদের মানসিকতায় ইংরেজি-প্রীতি ছিল অতি প্রকট। এটা যে প্রতিক্রিয়াজাত, সে কথাও মনে রাখব। এতো-দিন ইংরেজি না শিখে যে ভুল হয়ে গেছে, সেই ভুলের সংশোধন-চিন্তায় অনেকেই তখন অতি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, নবাব আব্দুল লতিফ ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি তাই 'লিটারেচার' চর্চার জন্য তত নয়, যত সমাজের উচ্চ স্তরের মুসলমানদেরকে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার জন্য।

সোসাইটির আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল, লিখিত ভাবে নয়, প্রচ্ছন্ন। সেটি হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তৎকালীন শাসক ইংরাজের মনে বিশ্বাস ও প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করা। পলাশীর বিপর্যয়ের পর সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত —এই একশো বছর ইংরাজের সঙ্গে মুসলমানের সম্পর্ক হচ্ছে সংঘর্ষ ও অবিশ্বাসের সম্পর্ক। মুসলমানেরা তখনও পর্যন্ত ইংরেজি শিখতে পারেনি ব'লেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার তাদের কাছে উন্মোচিত হয়নি —এই সত্যের উপলব্ধি সোসাই-টির কর্মকর্তাদের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি ইংরাজ-বিরোধিতার ফলে ইংরাজের অবিশ্বাস ও নির্যাতনের পাত্র হয়ে মুসলমানরা যে বিশেষ সুবিধাও করতে পারেনি, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে বোধও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিলনা। অত্যন্ত সচেতনভাবেই বাংলাদেশে নবাব আব্দুল লতিফ এবং উত্তর প্রদেশ স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরাজের সঙ্গে মুসলমানের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন। পক্ষান্তরে, হিন্দুমেলা চেয়েছিল ইংরাজ ও ইংরাজের সবকিছু সর্বপ্রযত্নে পরিহার করতে। একবার একজন ইংরাজ সস্ত্রীক হিন্দুমেলায় গিয়ে একজন বাঙালীকে চেয়ার ছেড়ে দিতে বললে মারামারি শুরু হয়ে যায়।

হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি একবার নিজেদের মধ্যে এই নিয়ম চালু করেছিলেন যে, কথা বলার সময় তাঁরা কেউ বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ব্যবহার করবেন না, করলে জরিমানা দিতে হবে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত এই লিটারারী সোসাইটিতে বাংলা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজি না জানলে সেখানে তার পরিবর্তে আরবী, ফারসী অথবা উর্দু চলবে, কিন্তু বাংলা নয়। তবে, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির একটা সর্বভারতীয় চেহারা ছিল' যা হিন্দুমেলার ছিলনা। হিন্দুমেলা ছিল মূলতঃই বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। সেখানে অবাঙালী হিন্দুদের কোনো ভূমিকা দেখিনে। কিন্তু মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান এসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এই লিটারারী সোসাইটির প্রভাব খুব বেশি নয়; তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিক, এবং বাংলা সাহিত্যের একজন উৎকৃষ্ট গদ্য-লেখক, মীর মোশাররফ হোসেনও সম্পূর্ণরূপে এই সোসাইটির প্রভাবমুক্ত ছিলেন। কিন্তু বাংলার বাইরে এই সোসাইটির প্রভাব অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং কল্যাণকর হয়েছিল।

একটি বিষয়ে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' 'হিন্দুমেলা' অপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। তা হচ্ছে—হিন্দুমেলায় কোনো মুসলমানের প্রবেশাধিকার ছিলনা। কিন্তু মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে যে-কোনো ধর্মের লোক যোগদান করতে পারতেন।

॥ ১ ॥

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ফরিদপুর জেলার অধিবাসী খান বাহাদুর আব্দুল লতিফ (তখনও নবাব হননি) এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর ১৬নং তালতলা লেন কলকাতার বাড়িতে প্রতি মাসে একবার ক'রে এই সোসাইটির অধিবেশন বসত।[১] বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হ'তনা ব'লে এই সোসাইটির কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে আজ আর জানবার উপায় নেই। সোসাইটির কোনো মুখপত্রও ছিলনা। তবে এর পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 'A Resume of its work,From 1863 to 1889' নাম দিয়ে যে পুস্তিকা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী প্রচারিত হয়েছিল তা থেকে এই সোসাইটির কর্মধারা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।[২] এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন মহীশুর রাজবংশোদ্ভূত মোহাম্মদ রহীমউদ্দিন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল সোসাইটির যে প্রথম অধিবেশন বসে তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগের অধ্যক্ষ (Head Professor) মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজীহ্। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'the most learned Arabic Scholar of his day and the acknowledged head of the learned and respectablc classes of the Mahomedan Community of Bengal.[৩]

নবাব আব্দুল লতিফ এই সভাতে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তা লিখিত হয়েছিল ফারসী ভাষায়। ফারসীর সঙ্গে সঙ্গে আরবী এবং ইংরেজিতেও প্রবন্ধ পাঠ করা হ'ত এখানে। উর্দুও চলত। স্থান ছিলনা কেবল বাংলার। অবশ্য এর কারণও ছিল। যাঁদের জন্য এই সোসাইটির কথা চিন্তা করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন মুসলিম সমাজের উচ্চস্তরের লোক। তাঁদের অনেকেই বাঙালী হ'লেও (যেমন আব্দুল লতিফ স্বয়ং), সেটাকে তাঁরা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার

ব'লে বিবেচনা করতেন এবং আরবী-ফারসী-উর্দুর চর্চাকেই তাঁরা আপন জাতীয় সাহিত্যের চর্চা মনে ক'রে গর্ববোধ করতেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই উচ্চস্তরের মুসলিম সম্প্রদায়কে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় উৎসাহিত ক'রে তোলা; দেশের সাধারণ মানুষের জন্য তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিলনা। The object of the society is to impart useful information to the higher and educated classes of the Mahomedan Community by means of Lectures, Addresses, and Discourses on various subjects in Literature, Science and Society, which are delivered, at the monthly meetings, in the Oordoo, Persian, Arabic and English languages.[8]

সোসাইটির এই বঙ্গভাষা-বিমুখতা প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল লতিফ ব্যক্তিজীবনে উত্তর ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের ভাবধারা দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ তাঁর জীবনে আমরা পাইনে। ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন সত্ত্বেও সে দেশের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মর্মবাণী কখনো তিনি অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের তিনি ছিলেন উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণরূপেই একজন প্রাচীনপন্থী মানুষ। আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্মীয় বিধিনিষেধকেই তিনি জীবনে বেশি প্রাধান্য দিতেন। মাইকেল মধুসূদনের তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত বন্ধু—ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা একখানি পত্রে মাইকেল তাঁকে Bismillah sort of a chap ব'লে উল্লেখ করেছিলেন, আর বলেছিলেন he is a clever fellow.[৫] বন্ধুর রসিকতা হ'লেও প্রথম উক্তিটি আব্দুল লতিফের চরিত্র-উদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়তা করে। আর দ্বিতীয় উক্তিটিও অত্যন্ত যথার্থ। যথার্থই তিনি খুব চতুর ব্যক্তি ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর মুসলিম সম্প্রদায়ের মন থেকে ইংরাজ ও ইংরেজির প্রতি বীতরাগ দূরীভূত করার চেষ্টায় তিনি অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের মন থেকেও মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস মুছে ফেলার ব্যাপারে প্রচুর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আব্দুল লতিফের পর থেকেই মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমেই ইংরেজের আস্থাভাজন হ'তে শুরু করে।

প্রথম অধিবেশনের মাসখানেক পর ১৩ই মে তারিখে বসে সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন। এই অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল—ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা, সংবাদপত্রের উৎপত্তি, বাণিজ্য, কলা, কৃষি, ভূগোল প্রভৃতি নানা বিষয়ে লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ।[৬] জানা যায়, এই ভাবে পঠিত নানা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও এখানে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হতেন। এফ, জি, তীলে নামক একজন ইংরাজ, তৎকালীন ভারত সরকারের টেলিগ্রাফ বিভাগের এ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর জেনারেল, 'বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ' (Electricity and the Electric Telegraph) বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ঐ বছরের ৭ই আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশনে। প্রবন্ধটি ইংরেজিতে পঠিত হ'লে নবাব আব্দুল লতিফ উর্দুতে তার আক্ষরিক অনুবাদ ক'রে সকলকে শোনান।[৭] ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত দশম অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ কানাই লাল দে রায় বাহাদুর, তাঁর বক্তৃতা ছিল 'দহনক্রিয়া' (Combutsion) সম্পর্কে। অনেক হিন্দু এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জে. পি. নরম্যানের মতো ব্যক্তিও ছিলেন।[৮] এ ছাড়া, সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ নেতৃস্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদেরকেও যোগদান করতে দেখি।[৯]

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৮৬৩-র ৬ই অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের উপস্থিতি। তিনি ঐ সভায় 'ভারতে স্বদেশপ্রীতি ও জ্ঞানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা' (Patriotism and the Necessity of promoting knowledge in India) বিষয়ে ফারসী ভাষায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১০] স্যার সৈয়দ আহমদ এই মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আব্দুল লতিফের একটি রচনাতে পাওয়া যাচ্ছে—My much esteemed friend, the well

known Moulvie Syed Ahmud Khan Bahadoor, then principal Sudder Ameen of Ghazipore visited Calcutta for the first time and was my honoured guest. He happened to attend the sixth Monthly meeting of the recently formed Mahomedan Literary Society and at that meeting he delivered a lecture in Persian on Prtriotism and the necessity of promoting knowledge in India. Shortly after his return from Calcutta my learned friend issued a Prospectus for the Establishment of a Society, the object of which was to print cheaply in Hindi, Oordoo, Persian and Arabic, the best works of European and American authors.[১১]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্যার সৈয়দ আহমদের এই প্রচেষ্টা তাঁর দেশের মুসলমানদের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল। বাঙালী মুসলমানের জীবনে আব্দুল লতিফের কর্ম প্রচেষ্টার কোনো প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ করা যায় না; কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের মূল্যবান গ্রন্থরাজি উর্দুতে অনূদিত হওয়ার ফলে উত্তর ভারত অঞ্চলের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও আধুনিক চিন্তা ধারার প্রভাব পড়েছিল। অবশ্য একথা সত্য যে, বাংলা ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা তখন আব্দুল লতিফের জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল না। বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা তখন ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছিল হিন্দু লেখকদের চেষ্টায়। তবে বাঙালী মুসলমানদের বাংলা বা ইংরাজি কোনো ভাষার প্রতিই অনুরাগ ছিল না ব'লে তাদের চিত্তের মুক্তি ও নবজাগরণ সুদূর পরাহত হচ্ছিল। এই অবস্থায় তাদের জন্য সব চেয়ে প্রয়োজনীয় যা ছিল তা হচ্ছে, বাংলা ও ইংরাজি —উভয়বিধ ভাষার প্রতি চিত্তের ঔৎসুক্য এবং অনুরাগ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির ভূমিকা বাঙালী মুসলমানদের জন্য আদৌ ফলপ্রসূ হ'তে পারেনি। কাজী আব্দুল মান্নান যথার্থই বলেছেন—'আব্দুল লতিফ ও তাঁর সোসাইটির আন্দোলন মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরে কিছু আশার সঞ্চার করেছিল। তবে সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে এঁরা বিশেষ কোন যোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। সামাজিক সমস্যার একটি বিশেষ দিকেই এঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের

চেষ্টাই তাঁরা করেছিলেন। হয়ত এ কারণেই তাঁদের আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমান বা তাদের ভাষা বাংলার জন্য এঁদের কোন দুর্ভাবনা ছিল না।'[১২]

কিন্তু পরোক্ষভাবে এই সোসাইটি বাঙালী মুসলমানদের কিছু কিছু উপকার সাধন করেছিল। ইংরাজরা রাজ্য ছিনিয়ে নেয় মুসলমানদের কাছ থেকেই, অতএব মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ ঐতিহাসিক কারণেই অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল। পক্ষান্তরে, হিন্দু জনসাধারণ ইংরাজ শক্তিকে জানিয়েছিল অভ্যর্থনা। এম. এন. রায়ের ভাষায় —'It is a historical fact that a very large section of the Hindu Community welcomed the advent of the English power.[১৩] ইংরাজেরা তাই প্রথম দিকে হিন্দুদের প্রতি সর্ব বিষয়ে দেখিয়েছে পক্ষপাতিত্ব। এমনও দেখা যায়, সরকারী চাকরির বিজ্ঞাপনে সেটা কেবল হিন্দুদের দেওয়া হবে ব'লে উল্লেখ করা থাকত।[১৪] পক্ষান্তরে, ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মুসলমান জন সাধারণ অত্যন্ত তীব্র ভাবেই ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল। ওহাবী আন্দোলনে বাংলা দেশের মুসলমানগণ যে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে বিষয়ে আজ আমাদের অনেকেরই একটা মোটা-মুটি ধারণা আছে। বিখ্যাত ওহাবী নেতা তিতু মীর কোনো হিন্দু জমিদার কর্তৃক দাড়ির উপর কর ধার্যের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[১৫] ব্যাপারটা ছিল প্রথমে মোটামুটি ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রাম। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এটাকে তাদের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভ্যুত্থান ব'লে মনে করেছিল, এবং সেইভাবেই তিতু মীরকে সেকালে চিত্রিত করা হয়েছিল। রাজবিদ্রোহী তিতু মীরকে দমন করার জন্য ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কিছু অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল। যুদ্ধে তিতু মীর শহীদ হন।[১৬] বাংলা দেশে ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ফারায়েজী আন্দোলনও তৎকালে বিশেষ ভাবে দানা বেঁধে ওঠে। ওহাবী আন্দোলনের মতোই এই ফারায়েজী আন্দোলনও প্রথম দিকে ছিল মূলতঃই একটি ধর্মীয় আন্দোলন; কিন্তু দুদু মিঞার নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত তা জমিদার ও শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে; এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজের কারাগারে তুতু মিঞার জীবনাবসান ঘটে।[১৭]

পাঞ্জাব অঞ্চলেও শিখদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত মুসলিম সম্প্রদায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে শেষ পর্যন্ত সেই শিখ-মুসলিম ঝগড়া ইংরাজদের সঙ্গে মুসলমানদের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। সে সময় বাংলা দেশ থেকেও অনেক মুসলমান যুবক সেই সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে সেই জেহাদে অংশ গ্রহণ করেন। উইলিয়াম হাণ্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থে সে সবের প্রচুর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় সাধারণতঃ কুড়ি বৎসরের কম বয়স্ক তরুণদের জেহাদে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা হ'ত এবং তাদেরকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চালান দেওয়া হ'ত।[১৮]

এ সবের ফলে ওহাবীদের সম্পর্কে ইংরেজদের বিরূপ ধাণরা ছিল খুবই স্বাভাবিক। সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর শিক্ষাগুরু শাহ্ আব্দুল আজিজ তো ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ব'লেই ফাতোয়া জারি করেছিলেন।[১৯] অতঃপর সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হ'লে ওহাবীরা প্রচুর সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঐ বিদ্রোহে যোগদান করেন।[২০] তাছাড়া, এমনিতেও সিপাহী বিদ্রোহে সক্রিয় ও প্রধান ভূমিকা ছিল মুসলমানদের। অতএব, যুক্তিসঙ্গতভাবেই, সিপাহী বিদ্রোহ হিন্দু মুসলমানের মিলিত বিদ্রোহ হ'লেও ইংরাজের বিচারে দোষটা শেষ পর্যন্ত ষোলো আনা মুসলমানদের ঘাড়েই পড়েছিল। মুসলমানেরাই ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য নানা সময়ে যে সব বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল তারই একটি সর্বশেষ সংহত রূপ প্রকটিত হয়েছিল ঐ বিদ্রোহে—এমনি একটি ধারণা হয়েছিল ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের।[২১]

এই ভাবে, লক্ষ করা যায়, মুসলমান সম্প্রদায় তখন ইংরাজের দৃষ্টিতে অতি বিপজ্জনক বিবেচিত হ'ত; ব্যাপক সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে মুসলমানদের সর্ব বিষয়ে খর্ব ও পঙ্গু ক'রে রাখাই ছিল ইংরাজের নীতি। এমনি একটা অবস্থায় নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় মুসলমান স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য ইংরাজ-শাসকের প্রীতি ও আস্থা অর্জনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি এ ব্যাপারে অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।···On occasions of extraordinary

importance, the Mahomedan Literary Society has always taken the initiative to give expression, on behalf of Her Majesty's Mahomedan subjects in India, to their feelings of devoted Loyalty to Her Majesty, Her Family and Her Throne.[২২]

সোসাইটির প্রথম অধিবেশনেই ইংরাজের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। অধিবেশনের সমাপ্তি টানা হয় ওহাবীদের মত খণ্ডন পূর্বক একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে।—The business of the day concluded with the reading by one of his pupils of an interesting and instructive Lecture, composed by the Venerable chairman himself, refuting some of the Doctrines of the Wahabis.[২৩]

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত একটি মাসিক অধিবেশনে জৌনপুরের অধিবাসী মৌলভী কেরামত আলী একটি প্রবন্ধে ওহাবীদের মতের প্রতিবাদ ক'রে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁর সামনে ছিল দুটি প্রশ্ন—

1st Whether, according to the religious tenets of the Hanafee Sect, British India is Darul Islam (country of Islam or safety) or Darul Harb (country of war or enmity).

2nd. Whether it is lawful or not for the Mahomedans of British India to wage war against their Rulers who profess the Christian Religion.

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মৌলভী সাহেব হাদিস ও ফেকা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ সহযোগে বলেন—British India, which is at present under a Christian Government is Darul Islam according to the dogmas of Hanafee sect. অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁর কোনো অসুবিধা আর রইলনা কেননা—This has been solved together with the first. For Jihad can by no means be lawfully made in Darul Islam.[২৪]

জানা যায়, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির পক্ষ থেকে মৌলভী কেরামত আলীর এই ফতোয়ার পাঁচ হাজার কপি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিলি করা

হয়েছিল। এর ফলে শাসক ইংরেজ যে খুবই স্বস্তি বোধ করেছিল, এবং তাদের মুসলিম-বিদ্বেষনীতির পরিবর্তন যে অনেকখানি ত্বরান্বিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুসলমানদের জন্য, বলাই বাহুল্য, ব্রিটিশ-নীতির এই পরিবর্তন কল্যাণকর হয়েছিল।

শাসক ইংরাজের মনোভাব মুসলমানদের অনুকূলে আনার জন্য বহুবিধ চেষ্টার নিদর্শন সোসাইটির কর্মসূচীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলমান গুপ্ত ঘাতকের হাতে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে পর পর মারা গেলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জে. পি. নরম্যান (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১) এবং ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১২)। দুটি হত্যাকাণ্ডই ছিল রাজনৈতিক। আব্দুল্লাহ্ নামে একজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী পাটনার কয়েকজন দেশপ্রেমিক মুসলমানকে অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়ার জন্য বিচারপতি জে পি. নরম্যানকে হত্যা করেন। তিনি সেদিন নরম্যানের মধ্যে দেখেছিলেন একজন বিদেশী অত্যাচারীকে, যিনি বিচারকের বেশে চালাচ্ছিলেন দেশবাসীর উপর অন্যায় অত্যাচার। যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কোনো আইনসম্মত পথ খোলা নেই, সেখানে এমনি গোপন হিংসাত্মক পথ বেছে নেওয়াইতো স্বাভাবিক। মনে রাখব, পরবর্তী কালে আব্দুল্লাহ্‌র প্রদর্শিত এই পথই বেছে নিয়েছিলেন খুদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীগণ। ভাইসরয় লর্ড মেয়োর গুপ্তঘাতক শের আলি খানও ছিলেন এই একই পথের পথিক। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন—'১৮৬৭খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আমার সঙ্কল্প ছিল যে, আমি একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করব।' তাঁকে বিচারের সময় প্রশ্ন করা হয়েছিল ..'কেন তুমি এই কাজ করলে?' উত্তর এসেছিল...'আল্লাহ্‌র হুকুমে আমি তা করেছি'। প্রশ্ন...'এই কার্যে তোমার কোন সঙ্গী আছে?' উত্তর ..'হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমার সঙ্গী'। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন···'ভাই সকল! আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করেছি, তোমরা সাক্ষী থেক যে, আমি মুসলমান।''[২৫] এ সব থেকে শের আলি খানের চরিত্র চেনা যায়।

এই দুটি হত্যাকাণ্ডেই মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির কর্মকর্তাগণ শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এবং এ ধারণা সত্যও ছিল যে,

এই হত্যার ফলে ইংরাজদের সঙ্গে মুসলমানদের বোঝাপড়া ব্যাহত হবে। বস্তুত, সোসাইটি তখন যে মনে প্রাণে ইঙ্গ-মুসলিম সম্প্রীতি কামনা করছিল এই সব হত্যাকাণ্ড ছিল ঐ সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। তাই দেখি, On the 5th October 1871, the Society Convened a Meeting for the purpose of "recording the deep and indescribable sorrow into which the Mahomedan Community had been suddenly plunged by the cruel assassination of the Hon'ble J. P. Norman."[২৬]

নরম্যান-হত্যার পাঁচ মাস পরেই মেয়োর হত্যাকাণ্ড। মেয়োর হত্যার কুড়ি দিন পর ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বসল সোসাইটির অধিবেশন, যেখানে... They resolved to record the unfeigned and heartfelt grief felt by the members of the Society and the Mahomedan Community in general, at the cruel assassination of the late Viceroy of India, and the unspeakable horror and indignation with which they learnt that the atrocious crime had been committed by a ruffian who professed the Mahomedan Religion."[২৭]

মেয়োকে হত্যার ব্যাপারটা শের আলি খানের দিক থেকে ছিল আল্লাহ্‌র হুকুমে কৃত একটি পুণ্যকর্ম এবং মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির দৃষ্টিতে সেটি বিবেচিত হয়েছিল একটি গুণ্ডার কাজ ব'লে। শের আলি খান এবং আব্দুল্লাহ্ উভয়েই ছিলেন সোসাইটির মতে 'convict villain'. সোসাইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা মনে রাখলে তাদের এবম্বিধ আচরণ অস্বাভাবিক মনে হবেনা।

যে উদ্দেশ্যে সোসাইটি এমন ইংরাজ-তোষণ নীতি গ্রহণ করেছিল তা কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হয়নি। উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীগণের কাছ থেকে সে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং তাঁদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টিতে সে সক্ষম হয়েছে যে, তাঁদের শাসনকার্যে সহায়তার জন্য কেবলই হিন্দুদেরই নয়, মুসলমানদের মধ্যেও একটি শ্রেণীকে সপক্ষে পাওয়া সম্ভব। এই শ্রেণীই ছিল নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—তারা তখন ইংরেজি শিখতে এবং ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা

করতে পুরোপুরি ছিল ইচ্ছুক। মনে রাখব যে, হিন্দুদের মধ্যে এমনি মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ইংরাজ রাজত্বের প্রায় প্রথম দিকেই। সে সময় সেই হিন্দু মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইংরাজ-সরকার যেমন সহানুভূতিশীল ছিল তেমনি এই মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির প্রতিও ইংরাজের প্রচুর সদয় মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

নবাব আব্দুল লতিফের এই সোসাইটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তৎকালীন ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স তাঁকে এক সেট এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা উপহার দেন। এই উপহারের সঙ্গে একটি স্বর্ণপদকও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। উপহারগুলি দেবার সময় তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট্‌-গভর্নরের সেক্রেটারী স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী বলেছিলেন...By founding the Mahomedan Literary Society (a Society Which now comprises nearly 500 members, and has become thc parent of similar Societies in other places), you have successfully led the Mahomedans, not only of Bengal, but of India generally, to look beyond the narrow bounds of their own system, and to explore those accumulated treasures of thought and feeling which are to be found embodied in the English language...you have materially promoted a good under standing between this class of the Community and their rulers and fellow-subjects.[২৮]

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি একটু যেন উগ্রভাবেই রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য ব্যগ্র ছিল। তার কারণও আমাদের পূর্বের আলোচনাতে নিহিত আছে। যখন দেখা গেল, ইংরাজ-বিরোধিতার পথে আর কোনোমতেই কিছুমাত্র সুবিধা করতে পারা যাচ্ছেনা, তখন এইটেই সেকালের বুদ্ধিজীবী মুসলিমদের মনে হয়েছিল যে, ইংরেজের শুভেচ্ছা ও প্রীতিকে শিরোধার্য ক'রেই পরবর্তী চলার পথ স্থির করতে হবে। বলাই বাহুল্য, তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী ছিল। তাহ'লেও, আজকের অনেকের কাছেই তাদের রাজভক্তি-প্রদর্শনের চেষ্টা খানিকটা উগ্রই মনে হবে।

দেখা যাচ্ছে, ইংলণ্ড রাজ-পরিবারের যুবরাজ দীর্ঘদিনের অসুখ থেকে সেরে উঠলে এই সোসাইটি আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়াহ্ জ্ঞাপন করছে।—When in

1872 His Royal Highness the Prince of Wales recovered from his dangerous and prolonged illness the Society made suitable arrangements, whereby the entire Mahomedan Community of the town and Suburbs of Calcutta offered up thanks giving to the Great Almighty Creator.[২৯]

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহারাণীর জীবননাশের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া উপলক্ষে এই সোসাইটি আনন্দ প্রকাশ ক'রে বাণী-পাঠায়। On the occasion of Her Imperial Majesty's Providential escape, in the begining of 1882, from an attempt on Her Life, the Society forwarded an Address of Loyal Congratulation to Her Majesty on behalf of Her Mahomedan subjects.[৩০]

মনে রাখতে হবে, নরম্যান ও মেয়ো সাহেব মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হ'লে স্বাভাবিকভাবেই ইংরাজদের কাছে মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়ে পড়ার যে আশঙ্কা ছিল তা থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার একটা স্বেচ্ছা-আরোপিত দায়িত্ব যেন এই সোসাইটি নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল।

মুসলিম শিক্ষায়তনগুলি সম্পর্কে তৎকালীন সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত সরকার একটি শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত করেন। তখন সেই কমিশনের কাছে এই সোসাইটি যে সকল প্রস্তাব পেশ করেন তার অধিকাংশই মোটা-মুটি গৃহীত হয়েছিল। When Sir William Grey appointed a Commission (consisting of Mr. C. H. Campbell, President, and the late Mr. J. Sutcliffe, and Nawab Abdool Lutteef Bahadur), to enquire into the backward condition of the Calcutta Madurassah, and suggest means for its re-organization, the Society convened a large Meeting at which a draft of an elaborate Address was prepared, embodying their opinions and suggestions on the matter, and submitted to the Commission. And,

to the extreme gratification of the Society, most of their suggestions met the approval of the Commission.'[৩১]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই শিক্ষা-কমিশন নাকি লক্ষ করেছিলেন—'জিলা স্কুল সমূহে উর্দু ও ফারসীর শিক্ষক না থাকার ফলেই মফঃস্বলের মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে পেছিয়ে পড়েছে'।[৩২] বলাই বাহুল্য, কমিশন এ ক্ষেত্রে যে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন আর-একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন, সেখানেও মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি তার বক্তব্য পেশ করেছিল। এই শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছিল—An attempt be made to prepare a moral text book, based upon the fundamental principles of natural religion, such as may be taught in all Government and non-Government Colleges.[৩৩]

এর প্রতিবাদে সোসাইটির পক্ষ থেকে নবাব আব্দুল লতিফ সরকারকে একখানি চিঠি লেখেন এবং এই ধরণের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করেন। ঐ চিঠির অংশবিশেষ হচ্ছে—I do not at all agree with the recommendation of the Education Commission that a moral text book be prepared, based on the fundamental principles of natural religion,—firstly, on the ground that natural religion is an unacceptable term to every firm believer in a particular religion like Islam, based upon express revelation. Those who found their faith upon such a basis are not prepared to join in an eclectic search amid the tenets of the many religions prevalent in India, and selecting therefrom some parts as natural, and rejecting others as artificial. Secondly, on the ground that there will be no security that a text book prepared by a mixed committee may not contain principles and expressions prejudicial to the faith of Islam. If, in a purely literary course, the Calcutta University could use no objection in selecting as texts for their examinations writings like "Addison's Spectator no 94" and "Scott's Talis-

man" full of the foulest abuse of the prophet of Islam, what hope can the Mohamedans have of absolute neutrality in a compilation which obviously must be prepared under the Superintendence of men of the most earnest religious convictions?

To my mind it is impossible to seperate morals from religion and I have therefore very little faith in the efficacy of secularised moral instruction as distinguished from religious instruction. From my point of view the only effective way for teaching morals to the young is to teach them the religion in which they have been born and bred, and which their guardians wish them to follow.[৩৪]

লক্ষ করা যাচ্ছে, ইংরাজের সঙ্গে আপোষ-নীতির মনোভাব নবাব আব্দুল লতিফের যতোই থাক, তাঁর মধ্যেও একটি মানুষ ছিল যাকে সর্ব অবস্থায় আপন নীতিতে অটল থাকতে দেখি। অবশ্যই এ মানুষটি ছিল সামন্ত যুগীয় মানুষ, ধনতান্ত্রিক যুগে বাস ক'রেও এর আসল চেহারাটাকে তাই কখনো চিনতে পারেননি। কিন্তু সমসাময়িক মুসলমানদের প্রয়োজন ও অভাব সম্পর্কে একটা মোটামুটি স্থূল ধারণা তাঁর ছিল। তাঁর সেই ধারণা দ্বারাই লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য দানবীর মুসলমানগণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা যে শিক্ষা-ভাণ্ডার গ'ড়ে উঠেছিল সেই টাকা কিভাবে ব্যয়িত হবে তাও উক্ত কমিশনের বিবেচ্য বিষয় ছিল। বিচারপতি আমীর আলীর উদ্যোগে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোশিয়েসন গঠিত হয়েছিল সেই এ্যাসোশিয়েসন ঐ কমিশনের কাছে দাবি জানায় যে, বাংলা দেশের মাদ্রাসাগুলো তুলে দিয়ে যে টাকাটা বাঁচানো যাবে তার দ্বারা মুসলমানদের জন্য কলেজ স্থাপন করা হোক। আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি এ প্রস্তাবের তুমুল প্রতিবাদ করেন। The Society Pointed out, that all such Endowments were intended by the Donors for the purpose of imparting Religious Education to the votaries of Islam, and that the appropriation of the Funds to Secular

Education would not only be contrary to the wishes of the Donors, but would deprive the Mahomedans of the means of receiving religious instruction which the Colleges and Schools maintained by Government did not provide. It is a source of satisfaction to note, however, that the majority of the Committee adopted the suggestions put forward by the Mahomedan Literary Society, thus keeping the Endowments intact for charitable purposes and religious education.[৩৬]

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি যা চেয়েছিল তা হচ্ছে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বজায় রেখে আধুনিকতার সঙ্গে সামান্য সন্ধিস্থাপন। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তৎকালীন ভারতবর্ষে এই সোসাটিই হচ্ছে প্রথম প্রতিষ্ঠান যা আন্তরিক ভাবেই ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চেয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তার আন্তরিকতার আরো প্রমাণ রয়েছে—এই সোসাইটি ও তার কর্মকর্তাগণ মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। The Mahomedan Literary Society as a further impetus to higher Education, set the example of endowing two Aunual Prizes of Rs. 20 each in commemoartion of the visit of His Excellency the Marquis of Ripon to the Calcutta Madrassah in 1883. Several Scholarships and Prizes were also founded by the Office Bearers and individual Members of the Committee on the occasion. The total amount subscribed by the Society and its eleven Members, came up to about Rs. 17000.[৩৭]

এখানে স্মরণীয় যে, লিটারারী সোসাইটির এই সকল কর্মপ্রচেষ্টা উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য বিশেষ কল্যাণদায়ক হয়েছিল। কিন্তু বাংলাভাষার বিরোধিতা করার ফলে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মুসলমান এর দ্বারা বিশেষ লাভবান হয়নি। আজকে অনেকখানিই আশ্চর্য মনে হবে যে, ব্যক্তিগতভাবে নবাব আব্দুল লতিফ নিজে বাঙালী হওয়া এবং ভালো বাংলা জানা সত্ত্বেও, স্কুলশিক্ষার বাহন হিসেবে মুসলমান ছাত্রদের জন্য উর্দু ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে একটি প্রশ্নের উত্তরে একবার তিনি বলেন—নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের

ভাষা বাংলা এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ভাষা উর্দু।[৩৮] বলাই বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গির স্পর্শ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতেও লেগেছিল। অথবা বলা যায়, তৎকালীন আশরাফ মুসলমানদের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন নবাব আবদুল লতিফ এবং তাঁর লিটারারী সোসাইটি। সে সময়কার মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় আশরাফ সমাজ উর্দু ভাষাকেই সর্বস্তরের বাঙালী মুসলমানের একমাত্র ভাষা ব'লে চালাতে চেয়েছিল। "সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাঙ্‌লা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, তাঁহারা বাঙ্‌লার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাঙ্‌লা নহে, দোভাষী বাংলাও নহে, একেবারে সরাসরি ভাবেই উর্দু।"[৩৯]

পরিশেষে বলা যায়, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপীয় নব্য দর্শনের প্রভাব থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতেও চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় মানসকে বুঝবার চেষ্টাও তাদের ছিলনা। প্রাচ্যভাবধারাকেই তাঁরা লালন ক'রে গেছেন তাদের সকল শক্তি ও ইচ্ছা নিয়ে। আর সর্বপ্রযত্নে তাঁরা এড়িয়ে চলেছেন সকল রকমের রাজনৈতিক বিতর্ক ও আন্দোলনের স্পর্শ। তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করলে মুসলমান চিন্তানায়কদের এ মনোভাবকে খুব একটা অযৌক্তিক মনে হবেনা। তবে খুবই আশ্চর্য মনে হবে, ১৮৮৫-তে সোসাইটি কর্তৃক কংগ্রেসের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা। ডক্টর আনিসুজ্জামান লিখেছেন— "১৮৮৫-র কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সোসাইটিকে একটি পত্র লেখা হয়। সোসাইটি সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাহত হবার আশঙ্কায়।"[৪০] কিন্তু তখন কংগ্রেসের যে ভূমিকা ছিল তাতে তার অধিবেশনে যোগদান করলে সত্যিই কি শাসক- সম্প্রদায়র সঙ্গে সেম্পর্ক ব্যাহত হবার আশঙ্কা ছিল ? অবশ্য এইভাবে তত্র যত্র ভূত দেখার অভ্যাস মুসলিম সম্প্রদায় আজো ত্যাগ করতে পারেনি।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজ-সহযোগিতার নীতি যেমন ছিল ঐতিহাসিক কারণ-সম্ভূত, তেমনি ঐতিহাসিক কারণেই ঐ সময় ইংরাজ সম্পর্কে হিন্দুদের মোহমুক্তির প্রথম পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইংরেজের নতুন ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার স্বরূপ দেশীবাসর বুঝতে সময় লেগেছিল। কিন্তু ঐ শোষণের ফলটা উপলব্ধির জন্য বিশেষ দুরদৃষ্টি বা সূক্ষ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না। ইংরাজ শাসনে বাংলা দেশ যে তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে হারিয়ে ইংলণ্ডে কাঁচামাল সরবরাহের বাজারে পরিণত হয়েছে এ কথা সহজ বুদ্ধিতেই তখন বুঝতে শুরু করেছেন অনেকে। হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন — "জগৎশুদ্ধ লোক কি কখনও কেরানী অথবা স্কুল মাষ্টার অথবা উকীল হইতে পারে? ··· শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আইলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাইনা। এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাইনা। দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাইনা। দেশ হইতে কিছুই হইতেছেনা।"[৪১] মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন— "ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়। কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? ······ অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"[৪২]

হিন্দু মেলার পশ্চাতে যে মানসিকতা কাজ করেছিল সেটা এখানে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। এরই সঙ্গে মিলিত হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে অঙ্কুরিত স্বদেশ-প্রীতি। ঠাকুর বাড়িই বোধ হয় বাংলা দেশের, তথা ভারতের, মধ্যে প্রথম যেখানে স্বাদেশিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। রবীন্দ্র-নাথের রচনায় পাওয়া যায় — "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দুরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"[৪৩] —এমন যে ঠাকুর বাড়ির আবহাওয়া সেই ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে হিন্দু মেলার যোগ প্রথমাবধি। হিন্দু মেলার সঙ্গে সব চেয়ে বেশি যে নামটি জড়িত সেই নব গোপাল মিত্র ঠাকুর বাড়ির এই স্বাদেশিকতার সংস্পর্শে আসেন তাঁর প্রথম জীবনেই। তিনি হিন্দু স্কুলে দেবেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন, সেই সূত্রে বাল্যকাল থেকেই ঠাকুর বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল।[৪৪] এই নবগোপাল মিত্রের মতো উগ্র ন্যাশনালিষ্ট কমই দেখা যায়। আহার বিহার ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে বাঙালী জাতি সম্পর্কে একটি মহৎ গর্ববোধ ছিল তাঁর মনে। একবার রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা, এদেশীয় প্রথম সিভিলিয়ান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—যব ও গমের মত ভাত পুষ্টিকর খাদ্য নয় এবং ভাত খায় ব'লেই বাঙালী দুর্বল জাতি। "এই কথা শুনে নব গোপাল বাবু মহা চ'টে উঠলেন। তিনি চিৎকার ক'রে আপনার অমত প্রকাশ ক'রে বললেন—'তা কখনোই হ'তে পারে না। তোমরা যাই বল, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব'।"[৪৫] নব গোপাল মিত্রের উগ্র স্বাজাত্যবোধ কখনো কখনো এমনি তীব্র আবেগে প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারাক্ষণই স্বদেশ চিন্তার মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতেন। "নব গোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলম্বনের দিকে আনা কর্তব্য। লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেন্টের দ্বারস্থ হয়, ইহা তাঁহার সহ্য হইতনা। এজন্য তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদ পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন; বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ করিতেন; এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন।"[৪৬]

এই ভাবেই হিন্দু মেলার চিন্তা এই নবগোপাল মিত্রের মনে প্রথম উদিত হয়; এবং তিনি ঠাকুর বাড়ির ও ঠাকুর বাড়ির বাইরে রাজনারায়ণ বসুর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। রাজনারায়ণ বসুও ঐ সময় গভীর ভাবে স্বদেশ

চিন্তায় রত ছিলেন। তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal—নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। "ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার ভার পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা 'good night' না বলিয়া 'সুরজনী' বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরেজী বাঙ্গালা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।"[৪৭]

নবগোপাল মিত্র এই মেলা স্থাপনের ব্যাপারে ঠাকুর পরিবাররও পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ তিন ভ্রাতার স্মৃতিকথা থেকে এই প্রসঙ্গে অনেক তথ্য জানা যায়—

"নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটি মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি,কামার কুমার ইত্যাদি লইয়া।"[৪৮]

"আমি বোম্বাইয়ে কার্যারম্ভ করিবার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধিসাধন হ'ল *।"[৪৯]

"এই সময়ই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্যে ও উৎসাহে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হইল।"[৫০]

রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই

---

* বড়দাদা—দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর
মেজদাদা—গণেন্দ্র নাথ ঠাকুব

মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"[৫১]

হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৬৭খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল; সেদিন ছিল চৈত্রসংক্রান্তি। পর পর তিন বছর এমনি চৈত্রসংক্রান্তির দিনেই এ মেলা বসত। সেজন্য এ মেলা চৈত্রমেলা নামেও পরিচিত ছিল।[৫২] যতোদুর জানা যায়, ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেলাটি নিয়মিত চলেছিল। তারপর এটি বন্ধ হয়ে যায়।[৫৩]

প্রথমে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলার সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহসম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ স্বদেশীয় সংগীতাদির চর্চা, কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ" এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। "সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয়, এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ইহার পরে মনোমোহন বসু প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায়, সঙ্গীত রচনা করিয়া দুঃখ করিলেন;—

কতকাল পরে বল ভারত রে!
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে; ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।"[৫৫]

এই সময় হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি ভালো মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ'ড়ে উঠেছিল। তারা ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় পুষ্ট ছিলেন ব'লে তৎকালীন ইউরোপীয় জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তাদের মানস-পরিচয় লাভ হয়েছিল। জাতীয়তার মন্ত্রে সদ্য-দীক্ষিত সেই বাঙালী হিন্দু সমাজের মধ্যে এই হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র ক'রে নানা কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। বিপিন চন্দ্র পাল লিখেছেন—"তখনও অস্ত্র-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক ছোড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিলনা। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু-

মেলার বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পাখী শিকারের ভান করিয়া বন্দুক-ছোড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন। এই হিন্দুমেলাতেই প্রথম নূতন রকমের তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল, ত্রিপুরা জিলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন, মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া—অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া—মহেন্দ্রবাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন...করিয়াছিলেন।..শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন।"[৫৬]

মেলার প্রথম অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু শিরোপীড়ার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। সে কবিতার মধ্যেও তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর জাতীয়-চেতনার স্পর্শ আছে। কবিতাটির কয়েক চরণ হচ্ছে—

দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা'তে বিদ্যমান॥
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তা'র সকলে মিলিল॥
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব বঙ্গীয় মাঝারে॥[৫৭]

বেশ কয়েক বৎসর এ মেলা চলেছিল। প্রতিবৎসরই সাধারণতঃ কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত কোনো উদ্যানে এ মেলা বসত। মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী। দেশীয় ক্রীড়া, ব্যায়াম, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধক কবিতা ও বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হ'ত এখানে। সবটা মিলিয়ে এখানে যা চলত তাকে বলা যায় স্বাদেশিকতার চর্চা। শেষবার একটিগণ্ড-গোলের মধ্য দিয়ে যে মেলা ভেঙে যায় আর তা কোনোদিন জোড়া লাগেনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে পাওয়া যায়—"শেষবারের মেলাতে একটা জাঁকালো রকমের মারামারি হয়। তারপর হইতেই হিন্দুমেলা বন্ধ হইয়া যায়।..বাহিরের ময়দানে ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন হয়। আমি একখানা চৌকি লইয়া ব্যায়াম দেখিবার জন্য বাহিরে যাইয়া এক জায়গায় বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন

হ্যাটকোটধারী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন ...পুরুষটি অতি রুঢ়ভাবে আসিয়া আমাকে চেয়ারটা ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলামনা। তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন...তখন সাহেব বাঙ্গালীতে পুরাদস্তুর মারামারি শুরু হইয়াছে। তারপর পুলিস আসিয়া হাজির হইল। ...বাঙ্গালী যোদ্ধৃবর্গ..ইট ছুড়িয়া পুলিসের দলকে আটকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ...শুনিয়াছি সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত নাকি ইহা চলিয়াছিল।"[৫৮]

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মেলার দ্বিতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। সেই ছয় দফা হচ্ছে--

১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্যসকল * সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ করতঃ এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সংগীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।[৫৯]

* লক্ষ্য সকল অর্থ—"স্বজাতীয় দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করা"।

হিন্দু মেলার এই কর্মসূচী একালের প্রগতিশীল চিন্তা ধারাকে হতাশ না ক'রে পারেনা। প্রকাশ্যে না হোক, মনের গোপনে এই মেলার কর্মকর্তাদের মধ্যে পরাধীনতার একটা বেদনা ছিলই। সেই বেদনাই একটা স্বাদেশিকতা-বোধের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁদের সেই স্বাদেশিকতা-বোধের মধ্যে মুসলমানদের কোনো স্থান হচ্ছেনা। মেলায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হ'ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত এই গানটি—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

কিন্তু হিন্দু মেলার কর্মকর্তাদের মতে ভারত সন্তান বলতে কেবল ভারতের, আরো সংকীর্ণ অর্থে কেবলি বাংলা দেশের, হিন্দুদেরই বুঝাত। তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়কে 'হিন্দু জাতি' ব'লে প্রচার করেন। এর দ্বারা মুসলমানদের পক্ষেও নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয়তার পথ বেছে নেওয়া সহজ হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দু মেলার এই মনোভাব কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্ন মনোভাব নয়। সেকালের সাধারণভাবে হিন্দু সমাজেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করেছিল এই হিন্দু মেলা। কিন্তু তাতে লাভের মধ্যে এইটুকু হয়েছিল যে, পরবর্তীকালের মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষকে প্রকারান্তরে সহায়তা করতে পেরেছিল তারা। একজন আধুনিক সমালোচক বলেন—"হিন্দু মেলার ··· মূল কার্যসূচী ও বিষয়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে এই ধরণের কোনো জাতীয় সংস্থা বা সংগঠন গড়িয়া উঠে নাই। দেশের স্বাবলম্বন ও একটি সর্বতোমুখী জাতীয় বিকাশের কথা ইহারা চিন্তা করিতেছিলেন। ধনী-অভিজাত শ্রেণী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, কৃষক, কারিগর, শিল্পী, মজুর—এক কথায় দেশের আপামর জন সাধারণকে হিন্দুমেলার-উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত ও একত্রিত করিবার যে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহা আর দেখা যায় নাই। ··· কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ইহার একটি প্রধান দুর্বলতা ও মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া গেল,— হিন্দু মেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের বাহিরে অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে পারে নাই। বস্তুত হিন্দু মেলার সময় হইতেই বাংলা দেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হইতে শুরু করে।"[৬১]

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে হিন্দুরাও যোগদান করতে পারতেন এবং করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু মেলায় কোনো মুসলমান বা মুসলমানের কোনো কিছু কখনোই স্থান পায়নি। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির জন্ম হয়েছিল উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমসম্প্রদায়কে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার ইচ্ছা নিয়ে—সমগ্র দেশতো দূরের কথা, সর্বস্তরের মুসলিম সমাজের কথাও তারা ভাবেনি। কিন্তু হিন্দু মেলার পটভূমিকায় ছিল ছিল স্বদেশচিন্তা, অতএব স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের নীরবতা ও ঔদাসীন্য সমালোচনার বিষয় না হয়ে পারে না।

পরিশেষে স্মরণীয় যে, হিন্দুমেলার জন্মলগ্নে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মোটেই ছয় বৎসর। ১৮৮০-৮১র দিকে মেলাটি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন তিনি উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক। শেষের দিকে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ এই মেলায় গান গেয়েছেন ও কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত মেলায় তিনি প্রথম স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতার নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি সম্পর্কে তৎকালীন সাংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—The Ninth Anniversary of the Hindoo mela was opened at 4 P.M. on Thursday, the 11th instant, at the well-known Parseebagan...on the Circular Road, by Rajah Komul Krishma, Bahadoor, the President of the National Society. ... Baboo Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory ; the suavity of his tone much pleased his audience.[৬২]

অমৃতবাজার পত্রিকার ১৪ই ফাল্গুন ১২৮১ (২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) সংখ্যায় কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এখানে কয়েক স্তবক কৌতূহলী পাঠকের জন্য উদ্ধৃত হ'ল—

(১)

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—

কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

(২)

স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

(৩)

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর কানন,
সাগর-উরমি, হরিত প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

(৪)

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

(১৮)

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

(১৯)

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

(২০)

অমার আঁধার আস্থক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিড়িয়া যাক্।

(২২)

মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর
ডুবুক আমার অমর জীবন
অনন্ত গভীর কালের জলে।[৬৩]

অতঃপর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার একাদশ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন তাঁর দ্বিতীয় কবিতা—এটি লিখিত হয় লর্ড লিটনের আমলে দিল্লী-দরবার উপলক্ষে।[৬৪] জীবন স্মৃতিতে এই কবিতাটি সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য-প্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে—তখনকার ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিতনা। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্স্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া।"[৬৫]

এই কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে দু-একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তিত ক'রে ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বৃটিশ' শব্দের পরিবর্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মোগল' শব্দটি বসিয়েছিলেন।[৬৬]

কবিতাটির অংশবিশেষ হচ্ছে—

দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার ভারতভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সন্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?

... ...

ব্রিটিশরাজের মহিমা গাহিয়া ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুর রাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ আসিছে ছুটিয়া অযুতবীর!

হারে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে?

ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাবনা

আমরা গাবনা হরষ গান,

এসো গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান।[৬৭]

পাদটীকা

১। মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত—Autobiography and other Writings of Nawab Abdul Latif Khan Bahadur, Dacca, 1968, পৃ. ১০৯।

২। পুস্তিকাটির পুরো নাম ছিল—A Quarter Century of the Mahomedan Literary Society of Calcutta—A Resume of its Work, From 1863 to 1889. মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত পৃ ১৪৩-১৫৬।

৩। মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫-৫৬।

৪। ঐ, পৃ. ১০৯।

৫। নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৬১, পৃ. ৬৫।

৬। মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬।

৭। ঐ।

৮। ঐ, পৃ. ১৪৭।

৯। ঐ, পৃ. ১৫০।

১০। ঐ, পৃ. ১৪৭।

১১। Abdool Luteef—A Short Account of my humble efforts to promote education specially among the Mahomedans; Calcutta, 1885, foot-note, p. 13-14.

১২। কাজী আব্দুল মান্নান—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রাজসাহী, ১৩৬৮, পৃ. ৬৩।

১৩। এম. এন. রায়—India in Transition [কাজী আব্দুল মান্নানের উপরি উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৯]

১৪। কাজী আব্দুল ওদুদ—বাংলার জাগরণ, কলকাতা ১৩৬৩, পৃ. ১২৫।

১৫। Imperial Gazetteer, Vol. xxiv, p. 71.

১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড), কলকাতা ১৩৫৬, পৃ. ৬৫৮।

১৭। আনিসুজ্জামান—মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৩৭১, পৃ. ৪৭।

১৮। উইলিয়াম হান্টার—দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্‌, আব্দুল মওদুদ কৃত অনুবাদ, ঢাকা, ১৩৭০, পৃ. ১০৮।

১৯। আনিসুজ্জামান—পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

২০। ঐ, পৃ. ৫০।

২১। C. F. Andrews & Girija Mukherjee–The Rise and Growth of the Congress in India, London 1938, p. 49 .

২২। মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত—প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

২৩। ঐ, পৃ. ১৪৬।

২৪। ঐ, পৃ. ১১৪-১১৯।

২৫। মুহম্মদ জাফর থানেশ্বরী—আন্দামানবন্দীর আত্মকাহিনী (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ), ঢাকা ১৩৬৯, পৃ. ৬৯-৭০।

২৬। মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত—প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২৭। ঐ।

২৮। ঐ, পৃ. ১৪৮।

২৯। ঐ, পৃ. ১৫১।

৩০। ঐ।

৩১। ঐ, পৃ. ১৫৩।

৩২। কাজী আব্দুল মান্নান—প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫।

৩৩। Report of the Indian Education Commission, 1883 p. 307.

৩৪। Journal of the East Pakistan History Association, Vol. I. No. I, March, 1968, p. 46-47.

৩৫। কাজী আব্দুল মান্নান—প্রাগুক্ত পৃ. ৫৯।

৩৬। মোঃ মোহর আলী সম্পাদিত—প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩৭। ঐ, পৃ. ১৫৩।

৩৮। কাজী আব্দুল মান্নান—প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩৯। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ৩০৬।
৪০। আনিসুজ্জামান—প্রাগুক্ত—পৃ. ৮৬।
৪১। রাজনারায়ণ বসু—সেকাল আর একাল, পৃ. ৬৪-৬৫।
৪২। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা ১৩৬২ পৃ. ২৩১।
৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী ১৩৬৬, পৃ. ৭৭-৭৮।
৪৪। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড) কলকাতা ১৯৬৩, পৃ. ৬৩৪।
৪৫। ঐ, পৃ. ৬৩৫।
৪৬। শিবনাথ শাস্ত্রী—পূর্বোক্ত পৃ. ২৩০।
৪৭। রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত, কলকাতা ১৩১৫, পৃ. ৮৩।
৪৮। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২০৬-৭।
৪৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, পৃ. ৩৫-৩৬।
৫০। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩২৬ঃ পৃ. ১২৭-২৮।
৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাগুক্ত পৃ. ৭৮।
৫২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ. ২৭৭।
৫৩। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত—প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।
৫৪। শিবনাথ শাস্ত্রী—প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।
৫৫। ঐ, পৃ. ২৩০-৩১।
৫৬। বিপিনচন্দ্র পাল—'হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র', বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃ. ৪৪০-৪২।
৫৭। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড), কলকাতা ১৯৬২, পৃ. ৫২২।
৫৮। বিপিনচন্দ্র পাল—পূর্বোক্ত
৫৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি : গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ১৯০।
৬০। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত—প্রাগুক্ত (২য় খণ্ড), পৃ. ৬৪।

৬১। নেপাল মজুমদার—ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১ম), কলকাতা ১৯৬১, পৃ. ১৪।

৬২। The Indian Daily News, 15th Feb. 1875.
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়, কলকাতা ১৩৫০, পৃ. ৭৫।

৬৩। ঐ, পৃ. ৭৫-৭৭।

৬৪। ঐ পৃ. ৭৮।

৬৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৬৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাগুক্ত পৃ. ৭৮।

৬৭। নেপাল মজুমদার—প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।